The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

তারাশঙ্করের উপন্যাসে নৈতিক সঙ্কট ও আত্ম অন্বেষণ

Bulbuli Oraon
Independent Researcher, M.A in Bengali, Cooch Behar Panchanan Barma University, West Bengal

DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400005

Abstract

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রোত্তর বাংলাসাহিত্যের একজন প্রধান উপন্যাসিক। তিনি ছিলেন রাঢ়বাংলা বীরভূমের এক জমিদার বংশের সন্তান। উনিশ শতকের একে বারে শেষ প্রহরে -১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তখন সমাজের এক যুগ সন্ধি। পল্লীবাংলার জীবনের অভিজ্ঞানতা দিয়েই তারাশঙ্কর বাংলা কথাসাহিত্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। আধুনিক উপন্যাসে ভিন্নতর জীবন-জিজ্ঞাসার একচিরায়িত মাত্রা যোজনার ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর নিঃসন্দেহ স্বাতন্ত্র্য সমুজ্বল। আত্ম-অন্বেষণ, যাকে পশ্চিমী চিন্তাবিদ্-রা বলেন সার্চ ফর আইডেনটিটি – ব্যক্তির সেই সত্তার পরিচয় সন্ধান এ যুগের মানুষের মনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে। বিগত যুগের স্থির ধর্মবিশ্বাস বা ঈশ্বরনির্ভতার আশ্রয় নেই একালের মানুষের। তাই সত্তা জিজ্ঞাসা এত তীব্র। একালের মানুষের সেই জিজ্ঞাসার যন্ত্রনার ছবি আঁকতে চেয়েছেন। ১৯৩০ থেকে তারাশঙ্করের সাহিত্যে জীবনের সূচনা। তার সাহিত্য সর্বাংশে জীবনভিত্তিক ও জীবনধর্মী। তারাশঙ্কর ছিলেন জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ এক মানুষ। তাঁর জীবনে যে সব বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তাদের বিশেষ মানসিকতার পরিচয় ও জীবন যাত্রার পরিচয় পরিচয় নিয়ে এসেছে তারাই অবশেষে ভিড় করেছে তার সাহিত্যের পাতায়। মানুষের পরিচয় পরিস্ফুট জীবনের দুইটি ক্ষেত্রে একদিকে তার ব্যক্তি তথা পারিবারিক জীবনে অন্তরঙ্গ দিক, অপরটি কর্মময় জীবন অর্থাৎ বহিরঙ্গগত। জীবনের এই দুটি ধারায় সমন্বিত রূপের মধ্যেই তার যথার্থ পরিচয়।

Keywords: *আত্ম অন্বেষণ, নৈতিক সংকট, ন্যায়-অন্যায় বোধের সংঘাত, অন্তচেতনার দর্পণ, আত্মিক সংগ্রাম, অন্তর্দ্বন্দ্ব, আত্মজিজ্ঞাসা*

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর বাংলা কথা সাহিত্যভুবনে তারাশঙ্কর যখন আবির্ভাব ঘটলো তখন বাঙালী পাঠক আকৃষ্ট হয়েছিল অনিবার্য ভাবে, সেই কল্লোল-উত্তরপর্বের পাঠক সমাজের কাছে তারাশঙ্করের আবেদন ছিল তাঁর অসামান্য বাস্তব নিষ্ঠার মাটি ঘেঁষা মানুষের রাজনৈতিক ও আর্থ সামাজিক জীবন বাস্তবতা বোধের। রাজনীতি অর্থনীতির জীবন বা আঞ্চলিক লোকায়ত জীবন থেকে অনেকটা সরে এসে ব্যক্তির অন্তর সত্তায় ডুব দিতে চাইলেন তারাশঙ্কর। মানুষের ব্যক্তিগত চেতনায় ন্যায়-অন্যায়ের সংঘাত, যন্ত্রনায় ক্ষত-বিক্ষত, সক্ষোভ হৃদয়ে শুদ্ধতার জন্য, উত্তরণের জন্য আত্মিক ছবি আলো-অন্ধকারের রঙে আঁকতে আগ্রহী হলেন তিনি। তারাশঙ্করের লেখার বিশিষ্টতা যেখানে, তা হল নিম্নবিত্ত, আদিবাসী সমাজের জীবনের ছবি আঁকার ব্যাপারে তিনি তার সময়ের প্রায় সব লেখককে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। জীবন অভিজ্ঞতার প্রাচুর্যে এবং বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবনছন্দ, প্রকৃতি ও প্রাণছন্দকে প্রতিষ্ঠিত করার চিরন্তন মূল্য বাংলা উপন্যাস জগতে তিনি অতুলনীয়। শরৎ পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের অন্যতম অধিনায়ক ছিলেন তারাশঙ্কর। যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের জীবন সমন্ধে আগ্রহ বিশিষ্ট বহু মুখি সাহিত্যকর্মই হলো তারাশঙ্করের উপন্যাস। সেখানকার পটভূমি ছিল তাঁর স্বক্ষেত্র তথা এই রাঢ়-বাংলা, এই বীরভূম জেলা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আবির্ভূত হলেন সেই কালে, যখন ভারতের ইতিহাসে জাতীয় জীবনের ধ্যান-ধারণায় গভীর পরিবর্তনের নানা সুর ধ্বনিত হতে লাগল স্বাধীনতার কামনাকে কেন্দ্র করে। উনবিংশ শতকের শেষাংশ এবং বিংশ শতকের প্রথম

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ভাগ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসাবে চিহ্নিত ভারত ইতিহাসে। তখন প্রবাহিত হচ্ছিল রাজনৈতিক কর্মসাধনায় প্রচণ্ড বেগবান, নতুন জীবনাদর্শে অনুপ্রেরিত গতিধীরা। পুরাতনকালের সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতায় প্রভাবিত সংস্কৃতি নানাবিধ নতুন চিন্তাধারা এবং কর্মপ্রচেষ্টার ফলে ঈষৎ কম্পমান ছিল। এই উত্তেজনাময় সময়ে জন্মগ্রহণ করলেন তারাশঙ্কর বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ৮-ই শ্রাবণ অর্থাৎ ২৮-শে জুলাই ১৮৯৮ সালে। তারাশঙ্করের পিতার নাম হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম প্রভাবতী দেবী। লেখকের বাবা ও মার প্রভাব তাঁর সজ্ঞান মনের উপর সর্বাধিক প্রভাব ফেলেছিল। জীবনের সংগ্রামের দিন গুলোতে তাঁর বাবার উজ্বল প্রেরণা অন্ধকার রাত্রে ধ্রুবতারার মত পথ নির্দেশক ছিল।

তারাশঙ্কর নিজে ছিলেন বীরভূমের এক জমিদার বংশের সন্তান। সমাজের এক ক্রান্তিকালে জন্ম নিয়েছেন তিনি। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র অতীত জীবনকে অসহায়ের মতো আঁকড়ে ধরতে চাইছে, অপরদিকে ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াছে আধুনিক পশ্চিমী নগরতন্ত্র। ব্যক্তিনির্ভর এক নতুন ধনতান্ত্রিক সমাজচেতনা। যুগসন্ধির মর্মস্পর্শী চেতনা তারাশঙ্কর পেয়েছিলেন, তাঁরই পারিবারিক পরিবেশ থেকে। একজন উপন্যাসিকের জীবন অভিজ্ঞানতা কতদূর ব্যাপক হতে পারে, জীবনের পাত্রে কতরকমের রস পরিবেশিত হতে পারে, তারাশঙ্কর না এলে তা বোঝা যেত না।

তারাশঙ্কর যখন উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করলেন তখন শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব সুবিস্তৃত। সমকালীন লেখকদের পক্ষে তাঁকে এড়িয়ে যাওয়া দুরহ ছিল। জগদীশগুপ্ত, নরেশ সেনগুপ্ত, উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই শরৎচন্দ্রের শিল্পরীতি অনুসরণ করেছিলেন সেক্ষেত্রে লেখক অবচেতনাশ্রয়ী মনস্তাত্বিক জটিলতার পথ ধরে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করার ফলেও প্রথানুক কল্লোলের কেউ কেউ বহির্মুখ হয়েছিলেন। প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বাসনায়, ইউরোপীয় উপন্যাসের আদর্শে, এবং অনেকটাই তাঁদের স্বভাবসুলভ উৎকেন্দ্রিকতায়। "তারাশঙ্কর অন্য ধরণের তাগিদে বাইলে বেরোলেন। তাঁর উপন্যাস যথার্থ পথের গ্রামগঞ্জ প্রান্তরের, গোষ্ঠীজীবনের, সম্প্রদায়ের, অঞ্চলের গৃহবলিভুক নয়।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। বাঙালি ভদ্রলোক বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে। দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার্থের মিছিল শহরের দিকে চলেছে। স্বপ্ন ঘেরা গ্রাম, জমিদারী-স্বচ্ছলতা বিধ্বস্ত হচ্ছে। পুরানো গোষ্ঠীজীবন ভেঙে পড়ছে। তারাশঙ্কর এইসব অভিজ্ঞাতার মধ্য দিয়ে চলেছেন। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির সমস্ত দেশ-কাল-মানুষ তারাশঙ্করকে বিষয় জুগিয়েছে। তার উপন্যাস রীতির মূলে গভীর প্রভাব ফেলেছে। শুধু যুগবৈশিষ্ট্যের জন্য এরূপ হওয়া সম্ভব ছিল না। পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর গভীর সমন্ধ, বিচিত্র গণগোষ্ঠী লোকেদের প্রতি আগ্রহ, তাদের জীবনকে জানা ও বোঝার মধ্যে, তাঁকে বিস্তৃত জনজীবনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে আকর্ষণ করেছে। ফলে রীতিঘটিত এই নবীনতা। পরবর্তীকালে তারাশঙ্করের শিল্পীমন স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিকল্পের মধ্যে ও আত্মানুসন্ধানের মধ্যে তিনি প্রবেশের পথ খুঁজেছেন।

চল্লিশের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে জীবন চিত্রকণে ও নিষ্ঠার বিচারে তারাশঙ্করের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। জীবনকে দেখার সুযোগ লেখক করে নিয়েছেন নানাভাবে। লাভপুরের পারিবারিক আবহাওয়ায় তার প্রথম সূচনা। তাদের জমিদার বাড়ি ছোট হলেও তাদের বাড়ীতে আসা যাওয়ার নানান ব্যক্তির নানান মানুষের সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও এখানে ওখানে যাওয়ার দরুণ বহুমানুষের সঙ্গে মেশবার দুর্লভ সুযোগ করে নিয়েছিলেন। তাদের জীবনের কথা তারাশঙ্করের লেখায় ফুটে উঠেছে অবিচলনিষ্ঠায়। প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য যথার্থ "বীরভূমের সঙ্গে যার কিছু কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে তার মনে হবে যে সরেজমিনে বীরভূমে এসে পড়েছে সে।"

তারাশঙ্করের সাহিত্যে সাধনার প্রস্তুতি পর্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে, আমরা আরও এক ধরণের মানুষকে খুঁজে পাই, যার মধ্যে দেখা দিয়েছিল অনমনীয় দৃঢ়তা, কঠোর পরিশ্রমশীলতা, সঙ্কল্পে অবিচলতা এবং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে একনিষ্ঠ সংগ্রামের মনোভাব।

তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসগুলিতে বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষের গোপন মনোভাব, জীবন জটিলতা হৃদয় রহস্য, বিপর্যয়ের ভয়ঙ্করতা, ঔদার্য ও নীচতা এমন বিরল উৎকর্ষমণ্ডিত ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন, যেগুলো উচ্চ মানের শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক। বাস্তব জীবনের রহস্যসন্ধানী তারাশঙ্কর তার লেখার জৈবিক বেগের লীলারহস্য উন্মোচন করেছেন। আদিম জীবলীলা বাস্তব অভিজ্ঞাতার মধ্য দিয়ে তাঁর কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছিল।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

বাংলা ১৩৩৮ থেকে ১৩৫৮ এই ৪২-৪৩ বছরে তারাশঙ্করের রচিত উপন্যাসের সংখ্যাই ছিল ৬৪। তাঁর উপন্যাস জীবনের সূত্রপাত, 'চৈতালী ঘূর্ণিতে' (১৩৫৮) আর সমাপ্তি 'নবদিগন্ত' (১৩৫৮)। তাঁর উপন্যাসিক মনকে বোঝার সুবিধার জন্য, তারাশঙ্করের সাহিত্য সাধনাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা চলতে পারে।

'চৈতালী ঘুর্ণী' থেকে ধাত্রীদেবতার পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৩৩৮-৪৬ প্রথম পর্ব। 'ধাত্রীদেবতার' পর থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৩৪৬-৫৩ দ্বিতীয়পর্ব। আর স্বাধীনতার পরবর্তী পর্বকে অর্থাৎ ১৩৫৪-১৩৫৮ তৃতীয়পর্ব আখ্যা দেওয়া যায়। প্রথমপর্বে অপরিণতির বহু চিহ্ন থাকলেও তার সাহিত্যিক জীবনের প্রায় সকল প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে তিনি রাজনীতি সচেতন ও তাঁর উপন্যাসে পরিণতির লক্ষণ। শেষ পর্বে কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের জীবন চিত্র অঙ্কনে তিনি মনোযোগি নন, ব্যক্তির আত্মজিজ্ঞাসা বা আত্ম অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে অধ্যাত্মলোকে যাত্রার প্রবণতা।

আমার আলোচ্য বিষয় তৃতীয় পর্বের উপন্যাস নিয়ে। ব্যক্তির নৈতিক সংকট ও আত্মজিজ্ঞাসার মূলক এই সব উপন্যাস ৫০-৬০-এর দশকে তারাশঙ্কর লিখেছিলেন। নৈতিক অপরাধবোধের পিড়ীত তারাশঙ্করের প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'কালিন্দী'। তারাশঙ্করের উপন্যাসে উচ্চারক ঘটনার কিছু আধিক্য আছে। শান্ত জীবনের সমতাল তাঁর রচনার প্রাপ্তব্য ছিল না। বাসনা-কামনার ফেলিল উচ্ছ্বাস, গুপ্তহত্যা, ষড়যন্ত্র, আত্মহত্যা, প্রতিহিংসা গ্রহণ, শক্তি পরীক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গৃহত্যাগ, ঘর জ্বালানো, চুরি-রাহাজানি জুলুম। এমনি নানা উত্তেজক ঘটনার সমাবেশ তাঁর উপন্যাসে উনবিংশ শতাব্দীর উদার মানবতাবাদে বিশ্বাসী হলেও তাঁর উপন্যাসের নায়কের মধ্যে তিনি দেখিয়েছিলেন, আত্মসচেতনতা এবং জীবন শক্তিতে নিত্য ক্রিয়াশীলতা।

কালিন্দী

'কালিন্দী' উপন্যাসটিতে লেখক আমাদের সম্পূর্ণ নতুন জগতে, মনোজগতে মুক্তি ঘটিয়েছেন। কালিন্দী উপন্যাসের পটভূমি লালমাটি বীরভূম রাঢ়ের বিশেষ অঞ্চল। কালিন্দীর নদীরচর, নদী পরিবেষ্টিত জড়-প্রকৃতি- এসবের সূত্রে উপন্যাসে রায় ও চক্রবর্তী বংশের বিরোধ সংঘর্ষের ছবি অঙ্কিত হয়েছিল। সেখানে পুরানো জমিদারী ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করায় তা শুধু নয়, রাঢ় অঞ্চলের একটি সামগ্রিক জীবনকে দেখানোর প্রয়াস সেখানে রয়েছে। রামেশ্বরের যৌবন বয়সের পাপচেতনা, অশরিরী প্রতিক্রিয়া ভাবনা এসব উত্তরসূরীদের মধ্যে 'কালিন্দী' উপন্যাসের বিষয়ে যে অভিনবত্ব এনেছে, তা বাংলা কথা সাহিত্য ভিন্ন স্বাদ দেয়।

কালিন্দী তারাশঙ্করের দ্বিতীয় শক্তিশালী উপন্যাস। ধাত্রীদেবতার প্রায় সমসাময়িক রচনা। 'কালিন্দী' ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়। 'কালিন্দী' উপন্যাসেই তারাশঙ্কর কিছু প্রতীক ও সাংকেতিকতার ব্যবহার করেছেন। রামেশ্বর যখন রাধারাণীকে হত্যা করলেন, তখন রাধারাণী রামেশ্বরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তাঁর হাতে কুষ্ঠ হবে, তিনি অন্ধ হবেন। এই অভিশাপই রামেশ্বরকে প্রতিনিয়ত তাড়িত করেছে। অন্ধকার ঘরে থেকেছেন, আলো থেকে দূরে থেকেছেন। হাতে কুষ্ঠ হয়েছে এই ভ্রম বিশ্বাসে বদ্ধ থেকেছেন। রামেশ্বরের নতুন জীবন সত্যের উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে উপন্যাসিক তারাশঙ্কর দুইটি পারিবারিক জীবনের বিশেষ জীবন সত্যে উত্তীর্ণ হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

"জানালাটা খুলিয়া দিয়া ভোরের আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুহূর্তের পর মুহূর্ত লক্ষ লক্ষ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া উদয়াচল হইতে ধারায় ধারায় আলোকের বন্যা ছুটিয়া আসিতেছে, চারিদিকে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। সহসা আপনার হাত দুইটি সেই আলোকের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিয়া বলিলেন- সাদা হয়ে গেছে। অস্থিচর্মসার রক্তহীন বিবর্ণ হাত।" এখানে নদী জীবনপ্রবাহের প্রতীক নয়, ধ্বংসের। আসলে 'কালিন্দী' উপন্যাসের মূল-থিম ধ্বংস ভেঙে পড়া জমিদারতন্ত্র, তার জগৎ, কৃষি-বিষয় বিনষ্টি এ উপন্যাসে চিত্রিত, তাই কালিন্দীর এই রূপ বর্ণনা। মানুষের জীবন নানা ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাতে চলে। সামাজিক ইতিহাস, ব্যক্তি ইতিহাস, ভৌগলিক ইতিহাস, 'কালিন্দী', উপন্যাসে এই তিন ইতিহাসই পারস্পরিক টানাপোড়নে এগোয়। ভৌগলিক ইতিহাসের উপর, মানবিক পায়ের দাগ এঁকে যাওয়া ছবি 'কালিন্দী'র অন্যতম মূল থিম।

কালিন্দী তে প্রথমা স্ত্রী ও তার শিশুপুত্রকে হত্যার জন্য রামেশ্বরকে নৈতিক যন্ত্রনাবোধই দারুণভাবে পীড়িত করেছিল। কোন আদালতের বিচারক তাকে মৃত্যুদন্ড দেননি, কিন্তু মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর ছিল তাঁর বিবেক যন্ত্রনা। তার ফলেই তিনি মাঝে মাঝে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। কাল্পনিক কুৎসিত কুষ্ঠব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত- এই দুশ্চিন্তার তাড়নায়, তিনি তার

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে এসে রামেশ্বর অনুভব করেছেন, তার দুই ছেলেই যেন, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে দুঃখ যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে। সর্বশেষে 'সূর্যদেবতার' কাছে আত্মনিবেদন ও প্রণাম রামেশ্বরকে যেন সর্বরোগ মুক্ত করেছে। এই আত্মিক উত্তরণবোধই তারাশঙ্করের ভারতীয় ঐতিহ্যচেতনার অভিজ্ঞান।

তামস তপস্যা

'তামস তপস্যা' উপন্যাসের নায়ক পানু। এক খুনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিনা অপরাধে তার পরিবার ও তার ওপর পুলিশী ঝামেলা হয়। পানুর তখন কিশোর বয়স। পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য, সে পালিয়ে যেতে থাকে রেলে, সেখানেও পুলিশের সঙ্গে দেখা হয়। অবশেষে পালাতে পালাতে সে গিয়ে পড়ে যাযাবরদের তাঁবুতে। সেখানে বুধন সর্দারের দলে ঘটল অন্তভূর্ক্তি। তাদের সঙ্গে মানিয়ে নিল পানু- বিয়ে করল রুকণীকে, হঠাৎ একদিন রুকনি আত্মহত্যা করল। পানু কিছুদিন উদাসীন হয়ে দিন যাপন করল। তারপর একদিন সে ঘি ফেরী করতে করতে, তার দেখা হল দিদির সঙ্গে। দিদি জমাইবাবু প্রথমে পানুকে চিনিল না। পানু এখন যাযাবরদের সংস্কারে লালিত সমর্থ যুবক। জামাইবাবু তার ঘরে স্থান দিলেও দিদি তাকে ভালো থালায় খেতে দিত না। অথচ কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে- মহাপাপী হইয়া যদি রাম নাম কয়। সংসার সমুদ্র তার বৎস পদ হয়। কিন্তু পানুর জীবনে তা ঘটল না।

নানাভাবে নানাজনের কাছে আঘাত পেতে পেতে পানু, তার জীবনসঙ্গী পেল একটি সুসংস্কৃত নারীকে। তার নাম রাজি। নানান মানুষের কাছে অত্যাচার ও বঞ্চনা পেয়েও পানু যা শেখেনি, রাজির আত্মহননে যা আয়ত্ত হল তা বিনয়। রাজির মৃত্যু তার জীবনে ঝড় বয়ে আনলো। তার জাবনে পরিবর্তনের ধারা প্রবাহিত হল। আশ্চর্য-পরমাশ্চর্য এ কণ্ঠস্বর পানুর সে কণ্ঠস্বর নয়। এ ভাষা সে ভাষা নয়। শুধু স্বর নয়- তাহার সর্বাঙ্গটাই যেন আগেকার পানুর নয়। এমন পরিবর্তন যেমন করে ঘটলো, কি করে ঘটলো, কেউ বুঝিতে পারে না। শুধু বিস্ময়ে অভিভূত হয়। তার দেহ বর্ণে রূপান্তর ঘটেছে, কাল রং গৌরবর্ণ হয় নাই। তার দেহের মধ্যে দেখা দিয়েছে পাণ্ডুশ্রী। সে কর্কশতা নাই। জীবনে এসেছে নম্রতা। সারা দেহটায় যেন তার ভাঙ্গাচোরা হয়ে গেছিল। পানুর চোখে শান্ত দৃষ্টির মধ্যে একটা বিচিত্র আভাস দেখা যায়। মনে হয় সজল একটা স্তর অহরহ টলমল করছে। পানুর গলায় তুলসী কাঠের মালা, নাকে কপালে তিলক, এই পানু যেন এই জন্মেই অভিনব গর্ভবাস অতিক্রম করে জন্মান্তর গ্রহণ করেছে।

পানু নিজেও জানে এ- তার জন্মান্তর। লোকেও তাই বলে। নম নারায়ণ বাবাও তাই বলেন। নম নারায়ণ বাবুর কাছে পানু দীক্ষা নিয়েছে। তাঁর এতসব তত্বকথা সে বুঝতে পারে না, বুঝতে চায় না। তবে রাজির জীবনের মধ্যেই তাঁর পুর্নজন্ম হয়েছে এ কথার মত সত্য আর কি আছে। তার চেয়ে একথা বেশী কে জানে, কে বোঝে। আপন মনেই কথাটা সে ভাবে অনুভব করে, ঘাড় নাড়ে। চোখ দিয়া তার জলও গড়াইয়া পড়ে। মনে পড়ে সে কি কষ্ট ! সে কি যন্ত্রনা ! দিনের পর দিন অন্ধকার ঘরে সে কাটিয়েছে। রাত্রে অন্ধকারে বসে থাকত রাজির সমাধির পাশে। রাজির মৃত্যু-রাত্রির স্মৃতিকে দীর্ঘ হতে সুদীর্ঘ করে চলেছে।

জীবনের নানা আঘাত-প্রতিঘাতের পর, পানুর জীবনে এল নানা পরিবর্তন। সারা জীবন ধরে নানা জনে নানা আঘাত করেছে। প্রতিনিয়ত পাওয়া আঘাত থেকে পানু শক্ত কঠিন প্রকৃতির মানুষ হয়ে উঠেছিল। তাই একটা অস্থি-চর্মসার রোঁয়া-ওঠা কদর্য চেহারা বাছুরকে লাঠি মেরে পানুর চোখে দল এল। অস্থি-চর্মসার গো-শাবক। বড় লালসাতেই সে পানুর গাছটার দিকে মুখ বাড়িয়েছিল। মায়ের দুধ পেট ভরে খেতে পায় না, হতভাগ্যের হাড়-পাঁজর সব বার হয়ে পড়েছে। গায়ের রোঁয়াগুলি পর্যন্ত উঠে গেছে। বেচারার মায়ের দুধের শেষ ফোটা পর্যন্ত গৃহস্থ টেনে বার করে নেয়। ক্ষুধার জালায় বড় লালসায় সে গাছটায় মুখ দিয়েছিল। মুখের পাশ দিয়ে সবুজ রস মিশ্রিত লালা গড়ে পরছে। সামান্য স্নেহে পানু তার গায়ে হাত বুলিয়েছিল। তাতেই সে কৃতজ্ঞতা ভরে পানুর হাত চাটছে। পানুর চোখে বার বার জল আসছে। বাছুরটাকে যে বঞ্চনা মানুষ করছে তাতে সে হয়ত বাঁচবে। সেই হয়ত শেষ আঘাত দিল। পানু এতকাল ধরে যে বঞ্চনা পেয়েছে- ঐ বাছুরটার বঞ্চনার তুলনায় সব যেন তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে।

'তামস তপস্যা' উপন্যাসটির প্রকাশকাল ছিল ১৯৫২ সাল। ঘটনাপুঞ্জ বীরভূম ও তার প্রান্তবর্তী এলাকা থেকে চয়ন করা হয়েছিল। সূচনা বীরভূমের এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম, যেখানে পাকা রাস্তা, থানা, হাইস্কুল ছিল। গ্রামের বিশ মাইল দূরে সদর শহর সিউড়ি গ্রামের শেষে কুখ্যাত সুঁদীপুরের বটতলা। বিবরণ থেকে বোঝা যায় এ গ্রাম তারাশঙ্করের নিজের লাভপুর ছিল। একটা মানুষের

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা আশা-আকাঙ্খা সংগ্রাম ও বিচিত্র অবিজ্ঞতায় বিশ্বাস ও আশাভঙ্গের এবং পরিণামে রূপান্তররের কাহিনী 'তামস তপস্যা'। তারাশঙ্করের সাহিত্য সাধনায় সমাজকে কেন্দ্র করে বিকৃত অস্বাভাবিক কিছু চরিত্রের পরিচয় মেলে, তারা যেন রাঢ়ের রুক্ষ কঠিন ভয়াল রূপেই সামঞ্জস্য পূর্ণ ছিল। পানু তাদের মধ্যে এক বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত।
সে জান্তব মানুষ, মূর্তিমান নৃশংসতা।

'তামস তপস্যা' উপন্যাসের নায়ক পানুর মধ্যে প্রবাহিত ছিল আদিম রক্তধারা। কিন্তু উপন্যাসের দীর্ঘায়ত ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে প্রবল নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ পানুর মনে বিবেক যন্ত্রনার দ্বন্দ্ব সংকট প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। জমিদারে নিরীহ গোবৎসকে নিদারুণ আঘাতে প্রায় হত্যা করে ফেলা এবং স্ত্রী রাজির আত্মহত্যা হৃদয়হীন পানুর জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটালো। তার অমানসিক ক্রোধ আশ্চর্যভাবে শান্ত হয়ে এল। রাজির মৃত্যু ভালবাসা হয়ে জন্ম নিল পানুর মনে। সে সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছিল এই তার ছিল তামস তপস্যা। অন্ধকার জীবনের পথ পেরিয়ে দুঃখ অনুশোচনার মধ্য দিয়ে আলোয় উত্তরণের জন্য যে তপস্যা সেটাই হল তামস তপস্যা। উপন্যাসের শেষে লেখক বলেছেন – সংসার ঘটনার কঠিন আঘাত অতি সাধারণ একটা ছেলেকে অরণ্যবাসে পাঠিয়েছিল। সহস্র বছরের অতীত সেখানকার অন্ধকারের মধ্যে পঞ্জীভূত হয়েছিল। পানু সেই অন্ধকার ভেদ করে আলোর পথে যাত্রা করেছেন।

বিচারক

(১৯৫৬) নৈতিক সঙ্কট চেতনার তীব্রতার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, 'বিচারক'। বিচারকের মুখ্যচরিত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ সমাজের উচ্চকোটির মানুষ ছিলেন, একজন দায়রা জজ। উপন্যাসটির অনেকখানি অংশ জুড়ে ছিল একটা খুনের মামালার বিচার কাহিনী। কিন্তু আদালত, মামলা, জুরি, আসামী ও ওই মামলার আইনগত প্রশ্ন- এসবই কিন্তু ছিল উপন্যাসটির ভিতরের অংশ। এইসব আইনগত পরিকাঠামোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্যক্তি মানুষের অন্তর লোকের অন্তর জীবনের প্রশ্ন। জড়িয়ে আছে ব্যক্তির গূঢ় জটিল নৈতিকতার সমস্যা।

কাহিনীতে আছে, জ্ঞানেন্দ্রনাথের এজলাসে খুনের একটা মামলা এসেছে। মামলার আসামী নদীতে জলমগ্ন অবস্থায় ছোটভাই এর কণ্ঠনালী টিপে হত্যা করে। আসামী জানিয়েছিল, যে নদীতে নৌকা উল্টে গেলে সে এবং তার ছোটভাই জলে পড়ে যায় এবং ছোটভাই সাঁতার না জানায় বড়ভাই আসামীকে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরে। আসামী বলেছে এর পরের ঘটনা সে বলতে পারে না। কিন্তু ছোটভাই সাঁতার না জানার জন্য, জলে পড়ে ডুবে তার মৃত্যু হয়নি। ছোটভাইয়ের কণ্ঠনালীতে পাঁচটি নখের স্পষ্ট চিহ্ন ছিল। প্রশ্ন এই, এটি কি খুনের ঘটনা ? অথচ চারপাশের নানা সাক্ষ্য তারই ইঙ্গিত করছে। এইরকম একটা জটিল প্রশ্নে জর্জরিত বিচারক ভাবছেন কী হবে তাঁর সিদ্ধান্ত। বিচারের ব্যাপারে জ্ঞানেন্দ্রনাথের বরাবরই আদর্শ ছিল 'ডিভাইন জাস্টিশ'। ঈশ্বরের মতোই তাঁর বিচার অমোঘ। তিনি হতে চান সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন। অবিচল ও প্রয়োজনে নির্মম। কিন্তু এই মামলা জ্ঞানেন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের মর্মমূলে আঘাত করেছিল। তাঁর চেতনায় ব্যক্তিগত ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন ও তীব্র নৈতিক সঙ্কট ক্রমেই ঘনায়মান মেঘের অন্ধকারে ছায়াবিস্তার করেছিল।

মধ্যবিত্ত নাগরিক চেতনাপ্রবণ মানুষের আত্ম-অন্বেষণের প্রয়াস ও ন্যায়-অন্যায়বোধের সংঘাত দীর্ণ জটিল অন্তচেতনার দর্শন ছিল এই উপন্যাস। উপন্যাসটির অনেকটা অংশ জুড়ে আছে একটা খুনের মামলার বিচার কাহিনী। এই মামলার ভিতরের অংশের আড়াল সরিয়ে ক্রমশ বিচারক জ্ঞানেন্দ্রনাথের মনে অনিবার্যভাবে উঠে এসেছিল, তারই অতীতের প্রথমা স্ত্রীর এক অগ্নিকাণ্ডে মর্মান্তিক মৃত্যুর দুঃসহ স্মৃতি। দীর্ঘদিন পরে আজ কঠিন নৈতিক দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত জ্ঞানেন্দ্রনাথের হৃদয়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন- বিচার কর আমার, শাস্তি দাও। তমসার সকল গ্লানির ঊর্দ্ধে উত্তীর্ণ কর আমাকে, মুক্তি দাও আমাকে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ নিজের বিবেকের দংশনে জর্জরিত হয়ে, সুবীকার করলেন তার স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য তিনি পরোক্ষ ভাবে দায়ী। অন্য নারীর প্রতি আসক্তি তার অবচেতন সত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। মর্মদাহী অপরাধবোধে ভারাক্রান্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে হৃদয়কে ভারমুক্ত করতে চেয়েছেন। আত্মিক শুদ্ধতার জন্য আত্মব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

আদালত থেকে ফিরে স্নানঘরের জানালায় বাবুর্চিখানার আগুনের রক্তিম প্রতিফলক দেখে জ্ঞানেন্দ্রনাথের স্মৃতিপটে ফুটে উঠেছিল অতীত জীবনের নানা ছবি। একদিন তাঁর ঘরের বাংলোয় আগুন লেগে যাওয়ায়, প্রথমা স্ত্রী সুমতিকে সেখানে ফেলে রেখে, তিনি ছুটে বাইরে এসেছিলেন। এ ঘটনা কি নিতান্তই আত্মরক্ষার জৈব তাড়না মাত্র ? নাকি, এর পিছনে ছিল সুমতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবক্ষয়। নাকি তারই আত্মীয়া শিক্ষিতা রুচিসম্পনা সুরমার প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ। বিচারের নৈতিক সত্তাকে এই প্রশ্ন প্রচণ্ড নারা দিয়েছে। প্রচলিত দণ্ডবিধিতে এই অপরাধ অপরাধ বলে গণ্য হয় না। কোন মানুষ বিচারক এর বিচার জানে না, তিনি নিজেও বিচারক ছিলেন, তিনি জানেন না কী এর বিচার বিধি, কী এর শাস্তি। বিচার করতে পারেন ঈশ্বর। ঈশ্বর ছাড়া এর বিচারক নেই। ঈশ্বরকে আজ সুবীকার করছেন তিনি। তবুও প্রকাশ্যে আত্মসমর্পণ করবেন।

বস্তুত খুনের মামলার আসামী ছোট ভাইকে জলমগ্ন অবস্থায় আঘাত করেছিল, কিন্ত তিনি নিজে অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রথমা স্ত্রী সুমতিকে আঘাত করেননি, কেবল হাত ছাড়িয়ে চলে এসেছিলেন। আসামীর সঙ্গে বিচারকের এইটুকু মাত্র তফাত ছিল। কিন্তু মনের গভীর স্তরে যেখানে কামনা-বাসনা, দ্বেষ-ক্রোধ মানবিক মূল্যবোধকে প্রতিহত করে, সেই ন্যায়-অন্যায় বোধের মানসিক দ্বন্দ্বের আলো-ছায়ায় আসামী ও জ্ঞানেন্দ্রনাথের আদৌ কোনো পার্থক্য ছিল কি ? এতদিন ধরে নৈতিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মৃত্যু হওয়া প্রথমা স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন- "তোমার জীবন বাঁচাতে আমি নিজের জীবন বিসর্জন দিতে পারতাম, দেওয়া উচিত ছিল, আমি তা পারিনি। আমি দিই নি। স্বীকার করছি আমি।"

মর্মদাহী অপরাধবোধে ভারাক্রান্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ আত্মবিশ্লেষণ আত্মজিজ্ঞাসা ও স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে আপন হৃদয়কে ভারমুক্ত করতে চেয়েছেন। আত্মিক শুদ্ধতার জন্য আত্ম বিহ্বল হয়ে উঠেছিলেন। যেন এতকাল পরে মানুষের আদালতে আজ তার বিচারের কোন সম্ভাবনা নেই। তাই মহান লোকোত্তর বিচারক ঈশ্বরের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের এই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে আভাসিত হয়েছে সৃষ্টা তারা শঙ্করের জীবনবোধ আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা, অন্যদিকে তেমনি পাঠক চিত্তকে প্রবলভাবে নারা দিয়ে গেছে। উপন্যাসের নায়কের আত্ম অন্বেষণের তীব্র আকুতি। পাঠক যেন নিজের সত্তার গভীরতম স্তরে সন্ধান করতে চায়, ন্যায়-অন্যায় নীতি দুর্নীতির গুঢ় প্রচ্ছন্ন সত্যকে।

উপসংহার

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তারাশঙ্করের শিল্পী-ব্যক্তিত্ব বিচিত্র উপাদানে গঠিত ছিল। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী জীবননিষ্ঠ শিল্পী। টলষ্টয়- রোলাঁর অধ্যাত্মচেতনা ও ন্যায় নীতির আদর্শ ও তারাশঙ্করের জীবনে প্রবল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতার মধ্যে, স্থির নক্ষত্রের মতো পথনির্দেশ করেছে। সেই পথের অনুসারী হয়ে তিনি অন্বেষণ করেছিলেন জীবনের মধ্যে নিহিত রহস্যের- তাঁর নিজের ভাষায় "বুদ্ধির অতিরিক্ত আর অনেক কিছু।" জীবন রহস্যের একটি দিক হল ব্যক্তিত্ব নৈতিক-সঙ্কট-চেতনা, তার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির রক্তজয়ী আত্মিক সংগ্রাম। মৃত্তিকাস্পর্শী যে জীবন-প্রত্যয় এই মাটি ঘেঁষা মানুষটির সত্তার বন্ধনে জড়িয়েছিল, "সেকাল থেকে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যবাদী যে মূল্যবোধগুলি ছিল তাঁর অস্তিত্বের প্রায়- অচ্ছেদ্য অংশ, তাদের ই এক পরিস্রুত।" তারাশঙ্কর তার তৃতীয় পর্বের উপন্যাসে রূপায়িত করলেন আত্মিক উত্তরণের পরিণামী চিত্র।

References

রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ, বাস্তবের গভীরে তারাশঙ্কর ও তিন নক্ষত্র, ১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা – ৭৩।
মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, তারাশঙ্কর দেশ কাল সাহিত্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা – ০৯, ১৯৯৮।
রায়, গৌরমোহন, তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা।
বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, সম্পাদিত তারাশঙ্কর অন্বেষণ, পুস্তক বিপণি।
রায় চৌধুরী, গোপিকানাথ, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্যে, দেজ পাবলিশিং-কলকাতা-৭০০০৭৩।
মুখোপাধ্যায়, আদিত্য, তারাশঙ্কর সময় ও সমাজ, পাণ্ডুলিপি, ১৯ কলোজ রোড, কলকাতা-৯।
বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, বিচারক উপন্যাস।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তামস তপস্যা উপন্যাস।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, কালিন্দি উপন্যাস।

All rights reserved. © 2026